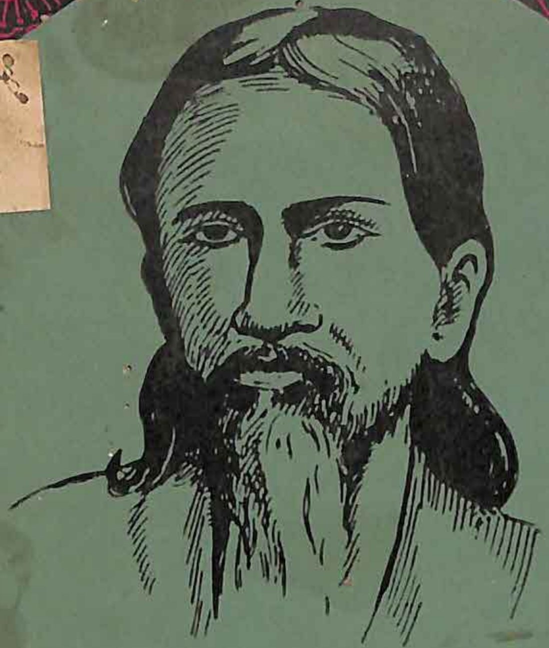


শ্রীঅরবিন্দ

এম এল দে এণ্ড কোং
১৩-১ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা - ১২

শ্রীঅরবিন্দ



'সবুজ-পত্র' যুগের

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার

প্রণীত

পণ্ডিচেরি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

কর্তৃক সংশোধিত

এম. এল. দে এণ্ড কোং

১৩/১ কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা—১২

এই ধরনের আরও কয়েকখানি বই

দাম ঃ আট আনা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস লিঃ
১৫।এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা—৬

শ্রীঅরবিন্দ



রামায়ণ-মহাভারতে তোমরা মুনি-ঋষিদের কথা শুনেছ। তাঁরা তপোবনের আশ্রমে থেকে তপস্যা করতেন, ঈশ্বরকে জানার জন্য আর মানুষের কল্যাণের জন্য। কিন্তু সে কতকাল আগের কথা! সে যুগের মানুষ যে কেমন ছিল তা' আমরা কেন, আমাদের বাপ্-ঠাকুরদাদারাও ঠিক জানেন না। কিন্তু এযুগেও যে তোমাদেরই দেশে এক জন সর্ব্বত্যাগী ঋষি ছিলেন, তা বোধ করি, তোমরা জান না। সেই মহাপুরুষ থাকতেন তাঁর পণ্ডিচেরির আশ্রমে। এই পণ্ডিচেরির নাম হয়ত তোমরা শুনেছো। ভারতবর্ষের মধ্যে হলেও পণ্ডিচেরি ভারত সরকারের অধীন নয়, ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অবশ্য এর প্রসিদ্ধি বেড়ে উঠেছে।

আমরা বাঙ্গালী তাঁকে পূজা করি দেবতার মত, ভালবাসি পরম আত্মীয়ের মত; সারা ভারতবাসী তাঁকে ভক্তি করে মরণজয়ী দেশভক্ত বলে', আর জগদ্বাসী তাঁকে নমস্কার জানায় মহাজ্ঞানী মহামানব ব'লে। বয়সে ছোট হ'লেও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন পরম স্নেহে 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'—বলে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যাঁকে শ্রদ্ধা জানান, নমস্কার নিবেদন করেন,—তাঁর মধ্যে নিশ্চয়ই যে এক অলৌকিক শক্তি বিরাজ করছে—এ তোমাদের না বললেও তোমরা বুঝ্‌তে পারছো। মহর্ষি অরবিন্দ এ যুগের এক বিস্ময়কর প্রতিভা! জগদ্বাসী তাঁকে মহা মানব বলে কেন জান? তাঁর জ্ঞানের অন্ত নাই, ত্যাগের সীমা নাই, সাধনার শেষ নাই! যিনি তাঁর উপদেশ-অমৃত পান করেছেন তিনিই মুগ্ধ হয়েছেন, লুটিয়ে পড়েছেন তাঁর চরণ তলে।

সে আজ আটান্ন বছর আগের কথা। তিনি সবে বিলেত থেকে ফিরছেন। দেশের দুর্দ্দশা দেখে তিনি ব্যথিত হলেন মনে-প্রাণে। তিনি বুঝলেন,—ইংরেজ-শাসন জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে, দাসত্বের ভারে ভারতবাসী নুয়ে পড়েছে। মানুষের মত বেঁচে থাকবার কান অধিকারই যেন তাদের নেই। অথচ মুখ ফুটে সত্য কথা বলবে সে পথও তাদের বন্ধ। মানুষগুলি যেন কলের পুতুল। বৃটিশ তাদের যেভাবে চালাচ্ছে,—তারা সেই ভাবেই চলছে। দেখে শুনে দেশবাসীকে ইংরাজদের হীন দাসত্ব থেকে মুক্ত করাই হ'লো তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যা। তিনিই দিলেন দেশবাসীকে দেশের জন্য হাসিমুখে প্রাণ দেবার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা, তাই তাঁকে আমরা বিপ্লবী বাংলার গুরু বলে' পূজা করি। আজ ভারত স্বাধীন হয়েছে; তাঁর সাধনা হয়েছে সফল। এখন তাঁর তপস্যা দেশবাসীকে শান্তিদানের পথ, ঐক্যের পথ, কল্যাণের পথ দেখান। আমরা বাঙ্গালী ধন্য হয়েছি এই মহামানবকে আপনার জন বলে' গৌরব করবার অধিকার লাভ করে'।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতবাসীর পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন! ঐ শুভদিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। কর্ম্ম-ক্ষেত্র খুলনা এবং রংপুরের বিশেষ পরিচিত তাঁর পিতা ছিলেন

কলিকাতার বিখ্যাত বিলেত-ফেরত ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ, আর তাঁর মাতামহ ছিলেন দেশভক্ত ঋষি রাজনারায়ণ বসু। বাল্যকাল হ'তেই স্বাধীন দেশে বস-বাস করে' স্বাধীন চিন্তা করতে ও উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারবে, এই ভেবে তাঁর পিতা তাঁকে সাত বৎসর বয়সেই ইংলণ্ডে পাঠান।

ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি প্রথমে সেণ্ট্ পলস্ স্কুলে ভর্তি হন। তার পর তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকেই চোদ্দ বৎসর বয়সে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে বৃত্তি লাভ করেন। কেম্বিজে পাঠ কালেই তাঁর অসাধারণ মেধা দেখে সকল শিক্ষকই মুগ্ধ হন এবং তাঁকে সন্তানের মত স্নেহ করতে থাকেন।

তারপর অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইংরাজী, ফরাসী, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্ম্মান, স্প্যানিস্ ও ইতালীয় ভাষা বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন। এই সময় থেকেই বোঝা যায়, কি অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

তারপর তিনি সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হন। পরীক্ষায় তিনি গ্রীক্ ও ল্যাটীন ভাষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তাঁর এই অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখে তাঁর সহপাঠী ও অধ্যাপকগণ সকলেই অবাক হয়ে যান। তাঁরা ভাবতেই পারেন নি যে, একজন ভারতীয় ছাত্র বিদেশী ভাষায় এমন কৃতিত্ব দেখাতে পারবে।

মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তিনি সেবার বি-এ পরীক্ষায় ক্লাসিক্যাল ট্রাই-পোসের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। সেই সময় বরোদার মহারাজা স্যার সয়াজীরাও গায়কোয়াড় কিছুদিনের জন্য লণ্ডনে বেড়াতে এসেছিলেন। তখন স্যার হেনরি কটনের ভাই মিঃ জেমস কটন মহারাজার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের পরিচয় করিয়ে

দেন। মহারাজা অরবিন্দের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিশেষভাবে মুগ্ধ হন এবং ১৮৯৩-র ফেব্রুয়ারীতে বিলেত থেকে যখন দেশে ফিরে আসেন, তখন তিনি শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী করে' সঙ্গে নিয়ে আসেন।

বরোদায় এসে কিছু দিন থাকার পর মহারাজা তাঁকে বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই সময় হ'তেই অরবিন্দের দৃষ্টি পড়ে স্বদেশের উন্নতির দিকে। তিনি বুঝতে পারেন দেশের উন্নতি করতে হ'লে সকলের আগে আনতে হবে ছাত্র ও তরুণদের ভিতর একটা নব জাগরণ। কেননা যুগে যুগে দেশ-বিদেশের ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তরুণ প্রাণে জাগরণের সাড়া না এলে কোন রকম রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। ঝড়-ঝাপটা বাধা-বিঘ্ন এড়িয়ে, এমন কি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ভয় না করে,—তরুণরাই এগিয়ে যেতেপারে বুক ফুলিয়ে। কাজেই তরুণ এবং ছাত্র সমাজ নিয়েই তিনি তাঁর আন্দোলন সুরু করলেন। তখনকার কংগ্রেসের সেই 'আবেদন-নিবেদন' করে' ইংরাজ-রাজের কাছ থেকে 'এক আধটু সুবিধা নেয়ার' যে নীতি ছিল, তা' তাঁর একেবারেই ভাল লাগলো না। তিনি ছাত্র জাগরণের দিকে মন দিলেন। সেই উদ্দেশ্যে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বরোদায় "তরুণ সঙ্ঘ" নামে একটি দল গঠন করলেন। এই সঙ্ঘের আন্দোলনের ফলে ছাত্রদল কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করল। তিনি নিজেও বোম্বহেয়ের "ইন্দু প্রকাশ" নামক পত্রিকায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এক জোরাল প্রবন্ধ লিখলেন। তিনি বল্লেন, তোমাদের দ্বারা কিছু হইবে না। এখনই এমন আন্দোলন করা দরকার যাহাতে দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনসাধারণের কল্যাণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ প্রভুদেরও জ্ঞান হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রচার কার্য্যও আরম্ভ করলেন সেই ভাবেই।

এই সময়ে পুণায় ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে গোপনে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়! পুণার ঠাকুর সাহেব এক গুপ্ত সমিতি স্থাপন করে' বিপ্লব সৃষ্টির আয়োজন করেন। রামকৃষ্ণ ও দামোদর চাপেকার নামক দুই ভাইও মহারাষ্ট্র দেশে আর একটি বিপ্লবীদল গঠন করেন। কিছুদিন পরে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় র‍্যাণ্ড ও লেঃ আয়ার্ষ্টকে হত্যা করার অপরাধে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হন। এছাড়া ঐ সময় পুণায় আরও দু'-একটি ইংরেজ হত্যা হয়।

শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন, মহাশক্তিশালী বৃটিশ রাজ-সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে সংগ্রাম করা তখনই সম্ভব নয়; কাজেই তিনি গুপ্ত বিপ্লবীদল গঠনের দিকে মন দিলেন। ১৮৯৬ সালে তিনি পুণায় ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত-সমিতির সভাপতি হ'লেন। তারপর চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসি হলে তাঁদের দল, অরবিন্দের বরোদার "তরুণ-সঙ্ঘ" এবং ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত-সমিতি, এই তিন বিপ্লবী-দলকে একত্র করে' শ্রীঅরবিন্দ নিজে তার সভাপতি হ'লেন। এই সকল গুপ্ত-সমিতির পরিচালক হ'য়ে তিনি সারা ভারতবর্ষে গুপ্ত-বিপ্লবী দল গঠন করবার জন্য প্রচার কার্য্য আরম্ভ করলেন।

এই সময়ে বরোদা থেকে তিনি নিজের জন্মভূমি বাংলদেশে প্রতিবছর পূজার ছুটিতে এসে রাজনীতিক কাজকর্ম্ম দেখে ও ব্যবস্থা করে যেতেন। কিন্তু অতি শৈশবে বিলেত যাওয়ায় তিনি বাংলা ভাষা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছিলেন। যদিচ বাংলা তিনি কেম্ব্রিজে থাকতেই পড়তে শিখেছিলেন এবং বরোদা-জীবনে বহু বাংলা গ্রন্থ নিজেই পড়েছিলেন। যাই হোক তাঁর মত অসাধারণ মানুষের কাছে অসম্ভব ব'লে কোন কিছু থাকতে পারে না। তিনি বাংলা-দেশ থেকে সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে মাইনে দিয়ে নিয়ে গেলেন বাংলা সাহিত্য চর্চ্চা করতে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই

চল্‌তি বাংলায় কথা বলা শিখে ফেল্‌লেন। তারপর "ভবানী পূজা" ও 'ভবানী স্তব' দেশের সকল জায়গায় প্রচার করবার উদ্দেশ্যে তিনি "ভবানী মন্দির" নামে একখানি বই বাংলা ভাষায় লিখে সর্ব্বত্র প্রচার করলেন। বাংলাদেশে গুপ্ত-সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি বরোদার মহারাজার দেহরক্ষী শক্তিমান্ পুরুষ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলায় পাঠালেন। যতীন্দ্রনাথের চেষ্টায় কলিকাতায় ও মেদিনীপুরে অনেকগুলি গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলো! এইভাবে শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশে পাকাপাকি ভাবে আসবার পূর্ব্বেই তাঁর উপদেশ মত কাজ বাংলার বহুস্থানেই আরম্ভ হয়েছিল।

১৯০৫ সালে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে এলেন। বাঙলায় এসে তিনি আবার সমস্ত গুপ্ত-সমিতির সন্ধান নিলেন এবং প্রত্যেকটির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হ'লেন। এই সময়ে ব্যারিষ্টার পি, মিত্র কলিকাতায় 'অনুশীলন সমিতি' নামে একটি গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করে' ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে তার শাখা-সমিতি গঠন করেন। আগে থেকেই শ্রীঅরবিন্দ এই সকল বিপ্লবী সমিতি-গুলির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কস্থাপন করেছিলেন, কারণ এই সময় প্রতি বছর বৈপ্লবিক কাজের জন্যই তিনি বাংলাদেশে আসতেন। ১৯০২ সালে বাংলায় এসে তিনি ব্যারিষ্টার পি, মিত্রের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে বিপ্লবকর্ম্মে দীক্ষা দেন।

তারপর ১৯০৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ-ভ্রাতা বারীন্দ্র অগ্রজের উপদেশক্রমে ও অর্থ সাহায্যে 'যুগান্তর' নামে বিপ্লবীদের একখানি মুখপত্র প্রকাশ করলেন। ঐ সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বিপিনচন্দ্র পালের "নিউ ইণ্ডিয়া" নামক ইংরাজী কাগজখানির "বন্দেমাতরম্" নাম দিয়ে তার সম্পাদনার ভার নিজে নিলেন। বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে

শ্রীঅরবিন্দই এই "বন্দেমাতরম্" পত্রিকাতে পরিষ্কার ভাষায় লিখেছিলেন, "আমরা চাই ব্রিটিশ কর্ত্তৃত্ব-বর্জ্জিত পূর্ণ স্বাধীনতা"। উত্তরকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের কণ্ঠেও ঠিক এই বাণীই ধ্বনিত হয়েছে। কাজেই একথা ব'ললে ভুল হবে না যে, শ্রীঅরবিন্দ যে বিপ্লবের অগ্নিবীণা বাজিয়েছিলেন তার রুদ্রস্বর ভারতের আকাশ-বাতাসে এক শাশ্বত শক্তির সঞ্চার করেছিল। তাই ভারতের বিপ্লব যজ্ঞের অন্যতম পুরোধারূপে শ্রীঅরবিন্দকে দেশবাসী চিরকালই স্মরণ করবে।

এরপর ১৯০৮ সালের গোড়ার দিকে শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লববার্ত্তা প্রচারের জন্য বোম্বাই, পুণা, পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। প্রচারকার্য্য শেষ করে' ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন তিনি কলিকাতায় ফিরে আসেন, তখন দেশের প্রায় সর্ব্বত্র বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠে। শ্রীঅরবিন্দকে সারা ভারতের বিপ্লবীদল গুরুর আসনে বসিয়ে তাঁর নির্দ্ধারিত পন্থায় কাজ করতে আরম্ভ করলো। এর অল্পদিন পরেই চতুর্দ্দিকে বিপ্লবীদের ধ্বংস-মূলক কাজ সুরু হলো! দেশের প্রায় সর্ব্বত্র রাজনৈতিক ডাকাতি, শ্বেতাঙ্গ হত্যা, গোয়েন্দা পুলিশ ও দেশদ্রোহী হত্যার হিড়িক পড়ে' গেল।

এই সমস্ত দেখে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পড়লো শ্রীঅরবিন্দের উপর কিন্তু সাক্ষাৎভাবে কোন বৈপ্লবিক কার্য্যের সহিত তাঁকে জড়িত করবার মত প্রমাণ-প্রয়োগ না পেয়ে, তাঁর "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ রাজদ্রোহমূলক ব'লে কলিকাতার পুলিশ তাঁকে অভিযুক্ত করল। বিচারের দিন শ্রীঅরবিন্দ যখন আসামীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ালেন, তখন বাংলার তরুণ উকিল-ব্যারিষ্টারগণ তাঁকে মুক্ত করবার জন্য

প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। শ্রীঅরবিন্দ অচল, অটল ; কোন চিন্তা বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নাই তাঁর মুখে। তিনি জান্‌তেন, তাঁর মধ্যে লেশমাত্র অন্যায় বা অসত্য নাই। বরং ন্যায় এবং সত্যের উজ্জ্বল প্রভায় তা চিরদিনই ভাস্বর। পরাধীন দেশের প্রত্যেকেরই অধিকার আছে তার জন্মভূমিকে—তার স্বদেশকে—অধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবার। বিচারক কিংস্‌ফোর্ড সাহেব পর্য্যন্ত হতভম্ব হয়ে' পড়লেন, কারণ শ্রীঅরবিন্দ নির্ব্বাক। উপস্থিত ব্যারিষ্টারগণ আইনের কূট-তর্কে বিপক্ষকে পরাভূত করে' শ্রীঅরবিন্দকে মুক্ত করলেন। কিংসফোর্ডের আদালতে যখন শ্রীঅরবিন্দের বিচার চলছিল, সেই সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নমস্কার জানিয়ে যে কবিতাটি লিখে পাঠিয়েছিলেন তা ভারতের জাতীয় ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে! ৭ই ভাদ্র ১৩১৪ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্ত্তি তুমি।.........
..................জয় তব জয়।
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিবে খর্ব্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিবে রক্ষা। কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হ'তে না পাইবে বল।
মোছ্‌রে, দুর্ব্বল চক্ষু, মোছ্ অশ্রুজল,
দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূত, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন শৃঙ্খল তার

চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা………

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতায় এক বিরাট আয়োজন হয়—গণপতি ও শিবাজী উৎসবের। সেই উপলক্ষে, নিখিলভারত বিপ্লবের নায়ক বালগঙ্গাধর তিলক, ডাঃ মুঞ্জে, সর্দ্দার অজিতসিং প্রভৃতি নেতারা কলিকাতায় আসেন। তাঁরা এসেই প্রথমে ঋষি অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন এবং অল্পক্ষণের কথাবর্ত্তাতেই শ্রীঅরবিন্দের মহিমায় এমন মুগ্ধ হন যে, তিলক মহারাজ তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হন। শিবাজী ও গণপতি উৎসব শেষ হ'লে বাংলার তরুণদের বুকে বিদ্রোহের আগুন যেন জ্বলে' উঠলো দাউ দাউ ক'রে। ঐসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী কাগজ "বন্দেমাতরম", বারীন্দ্রের "যুগান্তর", মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার "নবশক্তিতে" ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের "সন্ধ্যা' কাগজেও বিপ্লবী প্রবন্ধের আগুন ছুটতে লাগলো।

ঠিক এই সময়ে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক চন্দননগরের একজন বিপ্লবী শিক্ষকের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিপ্লব সাধনার কথা জানতে পেরে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে কলিকাতায় নিয়ে এলেন এবং তাঁকে "বন্দেমাতরম" কাগজে বিদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লিখবার ভার দিলেন। তখন বারীন্দ্র ও উল্লাসকর দত্তের নেতৃত্বে কলিকাতা মাণিকতলার এক বাগান বাড়ীতে বোমা তৈয়ারীর কাজ চলতে থাকে। শ্রীঅরবিন্দকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয় গোপনে। কাজেই বিপ্লব সাধক শ্রীঅরবিন্দের তখন তিলমাত্র অবসর ছিল না বিশ্রামের।

এদিকে ব্রিটিশ সিংহও ক্ষেপে উঠলেন এই সব রাজ-বিদ্রোহের ধ্বংস করবার জন্য। শামসুল আলম প্রভৃতি বাছা বাছা গোয়েন্দা পুলিশকে নিযুক্ত করা হ'লো বিপ্লবীদের বেড়াজালে ফেলতে।

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকির দ্বারা মিসেস কেনেডি ও মিস্ কেনেডির প্রাণনাশের ফলে পরদিন কলিকাতায় সর্ব্বত্র ধর-পাকড়ের ও খানাতল্লাসীর হিড়িক পড়লো। এই সম্পর্কে, মানিকতলা বাগানের বোমার কারখানা ত ধরা পড়লই উপরন্ত শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি বহু বিপ্লবী দেশভক্ত ধরা পড়লেন। পরদিন অপরাপর আসামীদের সহিত শ্রীঅরবিন্দকেও হাতে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বেঁধে আনা হলো এবং ঐ অবস্থাতেই জেল হাজতে রাখা হ'লো। শ্রীঅরবিন্দের এইরূপ লাঞ্ছনার কথা শুনে' নরমপন্থী গরমপন্থী সকল নেতা ও ইতর ভদ্র সকলে মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করলেন। উকিল ব্যারিষ্টার, এটর্ণি সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন শ্রীঅরবিন্দের মুক্তির জন্য। কিন্ত ঋষি অরবিন্দ ছিলেন নির্ভীক, নির্ব্বিকার, মহাযোগীর মত ধ্যানমগ্ন।

পূর্ণ বৎসর পর ১৯০৯ সালের ৬ই মে তারিখে এই আলিপুর বোমার মামলা শেষ হয়। শ্রীঅরবিন্দের পক্ষের ব্যারিষ্টার দেশবন্ধু চিত্তরজন তাঁর বক্তৃতা শেষ করার পূর্ব্বে বিচারপতিকে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যে কথাগুলি শুনিয়েছিলেন, আজ আমরা বুঝতে পারছি দেশবন্ধুর সেকথাগুলি ঋষিবাক্যের মত বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি বিচারককে সম্বোধন ক'রে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন, "আজ যে মহাপুরুষ আদালতে অভিযুক্ত, তাঁর সম্বন্ধে আমি এই কথা নিবেদন করতে চাই যে, মনে রাখবেন আজ তিনি মানব-ইতিহাসের বিচার শালায় দণ্ডায়মান আছেন! দূর ভবিষ্যতের একদিন যেদিন সকল উত্তেজনার অবসান হবে, আজকার এই বাদানুবাদের কথা

মানুষ ভুলে যাবে, হয়ত বা তাঁরও জীবনের মহান্ কর্ত্তব্য শেষ হবে, সেইদিন জগদ্বাসী আসবে ভক্তিঅর্ঘ্য নিয়ে এঁর স্মৃতির সম্মুখে, এঁকে দেশপ্রেমের চারণ কবি বলে', জাতীয়তার ঋষি বলে,' মানব-কল্যাণের পূজারী বলে' পূজা করতে। সেদিন এঁর মৃত্যুহীন বাণী ভারতের সীমা অতিক্রম করে সুদূরস্তর সমুদ্রপারে দেশ-দেশান্তরে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হবে মানব-সাধারণের অন্তরে।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতির আপ্রাণ চেষ্টায় শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি লাভ করে জেল হ'তে ফিরে এলেন। কিন্তু জেল থেকে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলেন তা' তাঁর অন্তরে যে কি গভীর রেখাপাত করেছিল তা' তাঁর স্বরচিত "কারাকাহিনী" পড়লেই বুঝা যায়। কারাকাহিনীর একস্থানে তিনি লিখেছেন—"জেলে চোর-ডাকাত সাধু হ'য়ে যায় না। ইংরাজের জেলখানা মানুষের চরিত্র শোধন করবার জায়গা নয়; বরং সাধারণ কয়েদীদের পক্ষে সেটা চরিত্র ও মনুষ্যত্বনাশের অনুকূল ক্ষেত্র মাত্র। তাহারা যেমন চোর-ডাকাত, নরঘাতক ছিল, তাই থেকে যায়। জেলখানায় গিয়াও তাহারা চুরি করে, কঠোর নিয়মের অধীনে থাকিয়াও নেশা করে, জুয়াচুরি করে' * * * * * * ইংরাজের এই ব্যবস্থায় কত দোষী বাঁচে, কত নির্দ্দোষ ব্যক্তি যে মরে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইউরোপে কেন যে সমাজ-তন্ত্রবাদ ও বিপ্লববাদের এত প্রসার ও প্রভাব হইয়াছে বিচারের নামে এই জুয়াখেলার মধ্যে একবার আসিলে, এই নিষ্ঠুর, নির্বিচার সমাজরক্ষক নামধেয় পেষণযন্ত্রের মধ্যে একবার পড়িলে তাহা প্রথম বোধগম্য হয়। এমত অবস্থায় ইহা আদৌ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, অনেক উদারচেতা দয়ালু লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এই সমাজ ভাঙ্গিয়া ফেল, চুরমার কর, এত পাপ, এত দুঃখ, এত নির্দ্দোষীর

তপ্ত শ্বাসে ও হৃদয়-শোণিতে যদি সমাজ রক্ষা হয়, তাহা হইলে তাহা রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন।"

দীর্ঘ এক বৎসর কাল কারাগারে বাসকালে শ্রীঅরবিন্দের ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন ঘটলো। এতদিন অন্ধকারের মধ্যে নানাভাবে ব্যাকুলচিত্তে তিনি যে জিনিষটি হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন, আজ যেন তা' তার আকুল সাধনার মধ্য দিয়ে স্বরূপে ফুটে উঠ্‌লো। তিনি প্রকৃতকর্ম্মের এবং তার পথের সন্ধান পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, বাইরের উত্তেজনামূলক আন্দোলন দ্বারা আর দেশের কাজ এগুবে না। এখন প্রয়োজন—সংযম ও কর্ম্মযোগের। উপযুক্ত সময়ের জন্য ধীরভাবে অপেক্ষা করতে হবে, বিপ্লবী কর্ম্মীদের ত্যাগ ও কর্ম্ম-যোগ অভ্যাস করতে হবে।

জেল হ'তে ফিরে এসে শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবী যুবকদের কার্য্যধারা পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে "কর্ম্ম-যোগিন্" নামে একখানি ইংরাজী পত্রিকা বাহির করেন। 'কর্ম্মযোগিন্' বাহির হইবার কিছুদিন পর শেষে আবার একটা নুতন যুগের সৃষ্টি হ'লো। বিপ্লবীদের বাইরের আন্দোলন কিছুটা কমলো বটে কিন্ত গোপনে গোপনে সংগঠন-কাজ সমান ভাবেই চলতে থাকলো এবং রাজনৈতিক ডাকাতির সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। বিপ্লবীরা তখন ব্যবসায়, কারবার, দোকান, শিক্ষকতা, প্রভৃতি কাজ উপলক্ষ্য করে' ত্যাগী কর্ম্মিদল গঠন করতে আরম্ভ করলেন।

এই সময়ে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত উত্তপ্ত দেখে' দেশকে আপাতত ঠাণ্ডা করবার উদ্দেশ্যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সে সময়ের ভারত-সচিব জন্ মর্লে সাহেবকে ভারতে পাঠালেন একটা নূতন শাসন-সংস্কারের খসড়া নিয়ে। তখন এদেশের নরমপন্থী নেতারা

আগ্রহের সঙ্গে সেই শাসন-সংস্কার মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত। তা' দেখে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'কর্ম্মযোগিন' কাগজে "দেশবাসীর প্রতি খোলা চিঠি" নামে অতি তীক্ষ্ণ ভাষায় এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখলেন। তা'তে তিনি দেশবাসীকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, ও-সংস্কার নিতান্ত ভূয়া সংস্কার, একটা ধোকা মাত্র। ঐ সংস্কার গ্রহণ করলে দেশের সর্ব্বনাশ হবে। এর থেকে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় এবং অরবিন্দের কথাগুলি যে বর্ণে বর্ণে সত্য,—অদূর ভবিষ্যতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অরবিন্দের প্রতিভা যে কতদূর পরিণামদর্শী, দেশবাসীর তা বুঝতে আর বাকী থাকে না। সেদিন অরবিন্দ গর্ব্বের সহিত বলেছিলেন,

"ইংরাজরা ভাবছে তারা বিপ্লবীদলকে শেষ করে' দিয়েছে, কিন্তু এটা তাদের মস্ত ভুল। তারা দিনে দিনে গোকুলে বাড়ছে। এখন কেবল অপেক্ষা, উপযুক্ত নেতার জন্য। অবশ্য সে নেতাও জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি যেদিন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন, সেদিন ইংরাজ রাজত্বের অবসান হবে।"

একজন 'কালা আদমি' ভারতবাসীর মুখে এতবড় স্পর্দ্ধার কথা! ব্রিটিশ সিংহ গেলেন ক্ষেপে। পুলিশের বড়-কর্ত্তারা স্থির করল যে, কোন ছলে অরবিন্দকে নির্ব্বাসিত করতে হবে, নতুবা ইংরাজ গভর্ণমেন্টের মঙ্গল নাই। কথায় বলে, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। এক্ষেত্রেও হ'ল তাই। ইংরাজ রাজ-সরকার মতলব স্থির ক'রে ফেল্‌ল।

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার হাইকোর্টে যখন আলিপুর বোমার মামলায় দণ্ডিত আসামীদের পুনর্ব্বিচার চলছিল, সেই সময় ১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারী বীরেন্দ্র দত্ত গুপ্ত নামে এক বিপ্লবী যুবক,

গোয়েন্দা পুলিশের বড়কর্ত্তা শামসুল আলমকে আদালতের সিঁড়ি দিয়ে নামবার পথে গুলি ক'রে' হত্যা করে। ফলে পুলিশ মহলে একটা প্রলয়-কাণ্ড উপস্থিত হয়। তারপর স্থির হয়, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ জড়িত আছেন—এই অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন করা হবে। কিন্তু মানুষের সাধ্য কি এই মহাযোগীকে কারারুদ্ধ করে' রাখে!

একদিন শ্রীঅরবিন্দ, শ্যামপুকুরের "কর্ম্মযোগিন" অফিসে —নলিনী গুপ্ত, বিজয় নাগ, ৺সুরেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতিকে নিয়ে বসে আছেন, এমন সময় তাঁর সহকর্ম্মীদের মধ্যে একজন সেখানে উপস্থিত হলেন এবং পুলিশের সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করলেন, শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর অন্তর্দেবতা তৎক্ষণাৎ কলিকাতা ত্যাগ করে' চন্দননগরে যেতে বল্‌লেন। শ্রীঅরবিন্দ মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করে' সুরেশ ও বীরেন দুই অনুচরের সঙ্গে নৌকাযোগে গঙ্গাঘাট থেকে চন্দননগরে রওনা হলেন।

এইভাবে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে চন্দননগরে গিয়ে মতিলাল রায়ের বাসায় মাসাধিক কাল থাকেন। তারপর সেখান থেকে পণ্ডিচেরিতে যান। পণ্ডিচেরিতে গিয়ে তিনি যোগসাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন। ভারতের সেই প্রাচীন ঋষিদের মতোই তাঁর জ্ঞানের দীপ তেমনি জ্বলছে অনির্ব্বাণ! কত দেশ-বিদেশের গুণী ও জ্ঞানীজন আসছেন তাঁর আশ্রমে—তাঁর জ্ঞানালোক লাভ করবার জন্য, কত উচ্চ শিক্ষিত লোক এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন—তাঁর মহিমায় মুগ্ধ হয়ে।

বিলাতী আবহাওয়ায় মানুষ হ'য়ে বিলাতী শিক্ষায় চরম জ্ঞানলাভ করেও শ্রীঅরবিন্দ ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা চরম শিক্ষা তা' ভুলে যাননি এতটুকু। যে জ্ঞানের পবিত্র আলোকে

প্রাচীন ভারতের তপোবন ছিল আলোকিত, সেই জ্ঞানের অনির্ব্বাণ শিখা তাঁর মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণের অন্তর থেকে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল তাঁর অন্তরে। আর সেই আলোক-শিখাই ক্রমশঃ উজ্জলতর হয়ে আজ তাঁর সমস্ত অন্তরকে আলোকিত করেছে তাঁর সাধন-জীবনে। তিনি বছরের মাত্র চারটি দিন আশ্রমের বাইরের লোকদের দর্শন দিতেন। সে-কদিন হাজার হাজার ভক্ত নরনারীকে তাঁর ধ্যানদীপ্ত প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখবার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে হত। শ্রীঅরবিন্দ এখন যেন পরমাত্মার সত্তার সঙ্গে নিজের সত্তাকে একেবারে মিশিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শ্রীমুখ দেখলে মনে হয় যেন জ্ঞান, করুণা, ত্যাগ এবং নিষ্ঠা এক সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে আসছে।

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা-জীবনের কাব্য-প্রতিভা সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে দু'একটি কথা না বললে তাঁর মনীষী জীবনের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়; তাই সে সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলা দরকার। তাঁর লিখবার শক্তিও ছিল যেমন অসাধারণ, তাঁর লেখাও ছিল তেমনি প্রাঞ্জল ও বলিষ্ঠ। আলিপুরে বোমার মামলার সময়ে বিচারপতি বীচক্রফটের সামনে অভিযোগকারী নর্টন সাহেব বলেছিলেন, "এই লেখাগুলি শ্রীঅরবিন্দেরই, ভারতবর্ষে এক অরবিন্দ ছাড়া এত চমৎকার ইংরাজী আর কেউ লিখতে পারে, ভারতীয় ভাবধারাকে এমনভাবে রূপ দিতে আর কেউ পারে, তা আমি বিশ্বাস করি না।"

রামায়ণ মহাভারতের অনেক অংশ এবং 'বিক্রমোর্বশী' নামক সংস্কৃত নাটকের তিনি যে ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন, রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তা'দেখে এরূপ মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, শতমুখে শ্রীঅরবিন্দের মনীষা ও সাহিত্য-প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এ

সকল ছাড়াও তিনি ইংরাজীতে যে সকল কবিতা লিখেছিলেন, তা' থেকে তাঁর উচ্চস্তরের কবি প্রতিভারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকা 'বন্দেমাতরম্', 'কর্ম্মযোগিন', বাংলা "ধর্ম্ম" এবং পরে "আর্য্য" প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি যে সকল অমূল্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন সাহিত্যের দিক দিয়ে তার তুলনা মেলে না। সেগুলির ভাষা যেমন বলিষ্ঠ ও চিত্তহারী, ভাব ও চিন্তাও তেমনি গভীর ও সুদৃঢ়। সাহিত্য ক্ষেত্রে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা হলেও দেশের ও দেশবাসীর পরম ভাগ্য যে, তিনি তাঁর প্রধান কর্ম্ম হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন, ভারতের সনাতন আদর্শ জ্ঞানের পথ, মুক্তির পথ, মানব-কল্যাণের পথ।

আজ তাঁর শান্তিময় আশ্রম প্রান্তে গিয়ে সংসার-জ্বালা-জর্জ্জর, শ্রান্ত, ক্লান্ত মানুষ লাভ করেছে শান্তির বাণী, আশার বার্তা, জুড়িয়ে আসছে সংসারের জ্বালা, হৃদয়ের ব্যথা-বেদনা; মিটিয়ে আসছে প্রাণের ক্ষুধা, অন্তরের পিপাসা। আজ তাই বিশ্ব কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে ইচ্ছা হয়—"অরবিন্দ, আমাদের লহ নমস্কার।"

—বন্দে মাতরম্—

মূল্য আট আনা মাত্র